গল্পসপ্তক : চোখে দেখিনি, শুধু...

রুশতী সেন

গল্পসপ্তক নামের কোনো বই কোনোদিন চোখে দেখিনি, এইটুকুই কেবল জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গল্পসংকলন প্রথম বেরিয়েছিল ১৩২৩ বঙ্গাব্দের শরতে, ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে, প্রিন্টার এবং পাবলিশার হিসেবে নাম ছিল অপূর্ব কৃষ্ণ বসুর। সাতটি গল্পই ১৩২১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সে বছর ২৫ বৈশাখ *সবুজপত্র*-র সূচনা। এই পত্রিকার বৈশাখ থেকে কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে লিখেছিলেন 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি', আর 'অপরিচিতা'। এদের নিয়েই *গল্পসপ্তক*। *গল্পগুচ্ছে* অভ্যস্ত পাঠকের কাছে সবকটি কাহিনিই খুব চেনা। একশ-দু-বছর আগে লেখা, একশো বছর আগে প্রথম মুদ্রিত এসব গল্পকে নতুন করে পড়বার বালাই বড়ো কম নয়। জীবনযাপনের যে জটিলতা সেদিন গল্পকারের চোখে পড়েছিল, তার থেকে আজ, শতাব্দীর এপারে, পাঠকের কোনো রেহাই নেই। বরং আরও শ্বাসরুদ্ধকর হয়েছে সেই জটিলের ভার।

ধরা যাক 'ভাইফোঁটা', যার প্রথম প্রকাশ *সবুজপত্র*-র ভাদ্র ১৩২১ সংখ্যায়। আজকের দিন- দুনিয়ার মতোই যেন নির্মম নির্দয় সেই গল্প। বিত্ত আর আত্মপ্রতিষ্ঠার তাড়নায় এ-কাহিনির কথক সমাজের বলিও যেমন, আবার খুনীও তেমন। যে সে পরিবার নয় তাদের। শুরুতেই আছে 'আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ।' ওই সততাই বুঝি একরকম সম্পত্তির উপমা হয়ে উঠল। অর্থাৎ,

> পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না; কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই....সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম...পঙ্গপালের মতো খরিদ্দার আসিতে লাগিল। (*গল্পগুচ্ছ অখণ্ড*, শ্রাবণ ১৪১৫ ব, পৃ. ৫৭৭, ৫৭৯)।

স্বদেশি এজেন্সির ব্রাহ্ম মালিক ধনের স্পর্শে ক্রমশ হয় লোভী, অন্ধ, নির্দয়। তার বাল্যসঙ্গিনী অনু নিজের অকালমৃত্যুর আগে রুগ্ন, কল্পনাপ্রবণ আর স্বপ্নদর্শী নাবালক পুত্রের দায়িত্ব দিয়ে গেছে এই পরম নির্ভরযোগ্য দাদার হাতে, সঙ্গে গচ্ছিত রেখেছে বেশ ভালো মাপের সম্পত্তি, যার সুবাদে ছেলেটির ভবিষ্যতে কোনোরকম অসচ্ছলতার স্পর্শ লাগবার কথা নয়। কিন্তু এই যে বালক সুবোধ, যে নাকি আরও অনেক পরে লেখা গল্পের

(অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫) বলাইয়ের মতো গাছের সঙ্গে অনায়াসে গল্প করতে পারে, সেই সুবোধের সব স্বপ্ন সব কল্পনাই এই নতুন অভিভাবকের প্রযত্নে নিতান্তই ব্রাত্য। সত্যি মিথ্যে, বাস্তব-অবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভবের চুলচেরা বিচার যে সততা-সাধুতার পোক্ত বেড়ির বাতিক মেনে চলে। কাল্পনিক মিথ্যের ভিতরে মিশে থাকা মস্ত মস্ত সত্যিগুলো এ-পরিবেশে কোনো লালন পায় না।

স্বদেশি এজেন্সির মালিকটি 'ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই' জানত, 'বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে'। (ওই, পৃ. ৫৮৬)। উপরন্তু সততাকে মূলধন করে যে ব্যবসার শুরু, তার সময় সর্বদা ভালো যায় না। আবার, যার মদতে এই কারবারের প্রসার, সেই অনুচরটির নাম প্রসন্ন। সুতরাং সততার ওই গৃহস্থালিতে সুবোধ যে আরামে বড়ো হচ্ছিল না, কল্পনাপ্রবণ নিষ্কর্মা থেকে তাকে চটপটে কাজের মানুষ বানানোর ঐকান্তিক চেষ্টা চলছিল, সেটাই সব কথা নয়। যে টাকা সুবোধের, স্বদেশি এজেন্সির বা সংলগ্ন কারবারের রক্ষণাবেক্ষণে যে-টাকায় হাত না দেওয়াই ছিল কারবারীর প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা, সেখানে ভালোমতোই হাত পড়ল। মাতৃহীন বালক সাতবছর বয়সে সততার জেলখানায় এসেছিল, আর গল্পেই আছে, 'সুবোধের বয়স যখন বারো বছর তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতায় গোটাকতক কালির অঙ্কে পরিণত হইল।' (ওই, প. ৫৮৫)। এমন যে ঘটতে পারে, তার সম্ভাবনা কিন্তু অনুর সম্পত্তি এবং পুত্রের দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই ছিল। আর সবার উপরে ছিল প্রসন্নর কেরামতি। ওই যাকে গোড়াতেই বলেছিলাম বিত্ত আর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাঙালপনা, তার বর্ণনায় 'ভাইফোঁটা' ভরপুর :

> কাজে প্রবেশ করিয়া...অন্তরাত্মা...বুঝিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই... কাজটা স্বভাবতই প্রসন্নর হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা এ ছাড়া প্রসন্নের মুখে আর কথা নাই। তার মতলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই দুইয়ে মিলিয়া...এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না...হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়। কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকায় সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনাফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম। (ওই, পৃ. ৫৮১)

সম্পত্তি আর সেই সম্পত্তিতে অধিকারবোধের ভয়াবহ চেহারা, কখনো-বা অনধিকারের সম্পত্তিতে হাত দিয়ে ফেলে তারপর অপরাধবোধের উগ্র বিকৃত ধরন—এসব উপাদানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের পাঠক বারবার পরিচিত হয়েছেন। সুবোধের সঙ্গে যে সম্পত্তি সুবোধের মা এই পরম বিশ্বাসভাজন দাদার কাছে জমা রেখে গেল, সে টাকা যখন প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা ভেঙে এজেন্সির কাজে এজেন্সির মালিককে ব্যবহার করতে হলো, তখন ওই সৎ মালিকের মন এমনই বিবশ হলো যে প্রথমে তিনি সুবোধকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন, তারপর সুবোধের উপরে বিষম রাগতে

শুরু করলেন, আর শেষে ভাবলেন, '...অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়।' (ওই, পৃ. ৫৮৫)। এদিকে সুবোধ নতুন অভিভাবকের প্রযত্নে স্বপ্নদর্শন রুদ্ধ করে এজেন্সি আর তার মালিকের বিভিন্ন কাজে পাকাপোক্ত হয়ে উঠছিল। ভিতরে ভিতরে যে সে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছে, নিঃশেষ হয়ে এসেছে তার জীবনীশক্তি, সে সত্যি যখন প্রকাশ পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আর মনে পড়ে লাভ কী, যে সুবোধের মা পুত্র আর পুত্রের ভবিষ্যতের রসদ হাতে নিয়ে প্রসন্নর কারবারের হর্তাকর্তাকে বলেছিল, '...আড়াল হইতে শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছে সুবোধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে...টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে... যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা-কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।" (ওই, পৃ. ৫৮৩)।

মনে যখন পড়ল এসব, তখন স্বদেশি এজেন্সির মালিক নিজের স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত ব্যয় করলেন সুবোধকে বাঁচাতে। যে সংসারে সুবোধের কোনো আরাম ছিল না, ছিল না আদরযত্ন, সেখানে ডাক্তারবদ্যি পথ্যি সেবা, কিছুরই অভাব রাখলেন না সুবোধের এই মামা। কিন্তু তখন তো আর কিছুই মামার নাগালের মধ্যে নেই। সম্পত্তির অধিকারে, অথবা সেই অধিকারের নেশায়, জেনে কিংবা না-জেনে মানুষ সর্বনেশে খেলার শরিক হয়। টেরও পায় না, কখন সম্পত্তিই তাকে খেলার পুতুল বানিয়ে ফেলেছে। মনে পড়ে 'ভাইফোঁটা'র তেইশ বছর আগে লেখা 'সম্পত্তি-সমর্পণ' নামের ভয়ানক গল্পটিকে। সম্পত্তিতে অধিকারের নেশা, সঠিক উত্তরাধিকারে সম্পত্তির বন্দোবস্ত নিয়ে অন্ধ উন্মাদনা, সব মিশে যজ্ঞনাথ নিজের নাতিকেই যখ বানাল। শেষ বেলায় হাহাকার করল, 'নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।' (ওই, পৃ. ৪৭)। মই নিয়েই জীবন শুরু করেছিল যজ্ঞনাথ, তবু সে মই হারিয়ে গেল। এমন হারানো যে ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম, এ-চৈতন্যে বিষণ্ণ ছিল, পূর্ণ ছিল রবীন্দ্রনাথের সৃজন। 'সম্পত্তি-সমর্পণ'- এর সাতবছর পরের গল্প 'পুত্রযজ্ঞ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫) মনে করুন। পুত্রের আশায় ব্রাহ্মণ ভজনায়, সন্ন্যাসী তোষণে ধনী বৈদ্যনাথের সম্পত্তি অপচয় হতে লাগল, আর বৈদ্যনাথেরই নিরন্ন পুত্র জনকের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রবেশাধিকারটুকুও পেল না। বরং কার্তিক ১৩১১ বঙ্গাব্দের গল্প 'গুপ্তধন'-এ স্বর্গের বর্ণ আর পৃথিবীর বুকে সূর্যাস্তের, বৈকালের অপরূপ রং-এর তুলনা করে করে শেষ পর্যন্ত অপরাহ্ণের সেই মহিমাকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন গল্পকার। সম্পত্তি কখনো সম্পত্তির যুক্তিতে যথার্থ সম্পদ হয়ে ওঠে না, সম্পদের অর্জনে প্রয়োজন পড়ে মানব মনের ব্যাপ্তি আর জাগরণ, এমনই বার্তা শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল গল্পে। জীবনের উদ্বৃত তবে সেখানেই, যেখানে মইয়ের নেশাকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করতে পারে!

আবার নাগালে মই নিয়ে তো সবাই জন্মায় না। তারা যদি মশগুল হয় ওপরে ওঠার নেশায়? তবে তারা প্রাণপাত করে মই তৈরির কাজে। 'সম্পত্তি-সমর্পণ'-এর ভয়াবহ

বিন্যাসের ঠিক দুই দশক পরে একই বছরে প্রথম প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প—'রাসমণির ছেলে' (আশ্বিন ১৩১৮) আর 'পণরক্ষা' (পৌষ ১৩১৮)। রাসমণির ছেলে কালীপদ জীবনটাই দিয়ে দিল মই বানানোর রোখে। শৈলেন্দ্র, যে মই নাগালে নিয়েই জন্মেছিল, তার মইটাও কি আর আস্ত থাকল কালীপদর মৃত্যুর আঁধারে? শেষ পর্যন্ত কেবল সরব রইল বগলাচরণ—সে তো এমনই একজন, যে কেবল নজর রাখে, সম্পত্তি যেন কোনোভাবেই সম্পদের হদিস না পায়। বংশীলাল তার পণরক্ষা করল, রাখল প্রাণের ভাই রসিকলালের অভিমানের মান। কিন্তু হায়, দাদার প্রাণপাত করে বানানো সেই সম্পদ তো তখন আর রসিকের কাজে লাগবে না। সে যে ততদিনে ওপরে ওঠার নেশায়, শক্তপোক্ত মই বানাতে গিয়ে বেচে ফেলেছে নিজেকেই। সম্পত্তি আর তার আকাঙ্ক্ষা, ধনদৌলতের মালিকানা আর সে-মালিকানার সংরক্ষণ, কৃতকার্যতার দৌড়বাজিতে ছোটা আর ছোটা—এসব কথার ভালোমন্দ যতবার প্রত্যক্ষে এসেছে রবীন্দ্রনাথের গল্পে, তার সর্বশেষ বোধকরি 'ভাইফোঁটা'। যজ্ঞনাথ বা বৈদ্যনাথের মতো মই নিয়ে জন্মায়নি 'ভাইফোঁটা'র কথক। আবার কালীপদ বা রসিক-বংশীদের মতো অত অপাঙ্‌ক্তেয়ও নয় সে তার দেশের অর্থনীতিতে। শহুরে মধ্যবিত্ত এই লোকটি সততাকে প্রয়োগ অথবা অপপ্রয়োগ করল সম্পত্তি বানানোর দৌড়ে। ফলে নিজের প্রতাপেই সে মারল নিজের বিবেককে, ভবিষ্যকে, নিজেকে। যখন সে সুবোধের জন্য সব যত্ন সাজিয়ে তুলতে চাইল, সুবোধ তখন সে যত্নের অতীত। 'ভাইফোঁটা'য় আছে :

> ...টাকায় তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর গ্রহণ করিতে পারিল না। (ওই, পৃ. ৫৮৭)

এরপর সুবোধের মৃত্যুর ভার নিয়ে যতদিন বাঁচবে স্বদেশি এজেন্সির মালিক, স্বপ্নদর্শী ওই কিশোরের মরণ অভিশাপ হয়ে তাকে বাজবে। অভিশপ্ত সেই জীবনের দাহ হবে মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক। সম্পত্তির এ-খেলা এমনই ভীষণ যে সংলগ্ন অনুতাপও অনর্থক হয়ে পড়ে। অপরাধবোধের যদি কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে সে-অর্থ হয়তো গ্লানিতেও প্রলেপ দিতে পারে। সে রেহাই-ও নেই লোকটার, তার অকৃত্রিম পরিচয় মেলে কেবল বীভৎস খেলার অন্ধ বেওকুফ উপকরণের উপমায়। 'শূন্য হাতে তার মায়ের কাছে সে ফিরিয়া গেল' (ওই)—এই হাহাকার সার্থক যোজনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'ভাইফোঁটা'র কথকের বয়ানে। আজ শতাব্দীর এপারে দাঁড়িয়ে দেখি, ওই হাহাকারের বাস্তব এতটুকু মরেনি। কেবল দীর্ঘ থেকে আরও দীর্ঘ, আরও আরও দীর্ঘ হয়ে চলেছে ওই অনুতাপে পৌঁছনোর পথ। সেটাই স্বাভাবিক। শতাব্দী ব্যেপে সম্পত্তির খেলায় জটিলতা বেড়েছে, প্রতাপ বেড়েছে, অসহায়তাও বেড়েছে, আর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে হৃদয়হীনতা।

আমাদের প্রজন্মের পাঠকদের সচরাচর চোখে না-দেখা *গল্পসপ্তক* কি তার এক-একটি গল্পে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প চর্চার এক-একটি চলনকে তার সব থেকে পরিণত অবয়বে

পৌঁছে দিয়েছিল? 'হালদারগোষ্ঠী'র বড়োবাবু বনোয়ারি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরনোর সময় একটি হদিসই রেখে গিয়েছিল—সে চাকরি খুঁজতে যাচ্ছে। পরবাসী জীবন আর সে-জীবনের বিকল্প সন্ধান রবীন্দ্রনাথের গল্পে যতরকম মাত্রা পেয়েছে, তার গভীরতম সংযোজন কি গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদারগোষ্ঠীর কাহিনি? 'হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'কে ঠাকুরবাড়ির চার দেয়ালের বন্ধনে বন্দি বালক পরম আকুলতায় লালন করত। যখন সে বাইরে এল, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যখন ঘটল নিবিড়তর যোগাযোগ, তখন বুঝতে হলো তাকে যে, পরবাস-বন্ধন কেবল বিশ্বপ্রকৃতির দর্পণে নয়, সমাজ-সংসারের স্তরে-স্তরে। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্তিক 'অতিথি' গল্পটির প্রথম প্রকাশকাল। তারাপদকে অবশ্য সমাজ-সংসার তেমন কোনো দায়িত্ব দেয়নি। তারও আগে ১২৯৮তে 'পোস্টমাস্টার'। শহরের ছেলে যে রুজির তাড়নায় বাঁশবন আর রাশি রাশি মশার দেশ সেই প্রত্যন্ত গ্রামে বন্ধুহীন, ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট জীবনযাপন করে, এ-তো নিম্নবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির পরবাস-কাহিনি। আর অনাথ বালিকা রতনের তো জীবন জুড়েই পরবাস। 'সমাপ্তি'তে (আশ্বিন, ১৩০০) মৃন্ময়ীর পিতা ঈশান সংসারের স্থিতি বজায় রাখতে সেই সংসার থেকে অনেক অনেক দূরে ক্ষুদ্র এক স্টেশনে বসে বছরভর মাল ওঠায়, মাল নামায় আর টিকিট বেচে। নিজের বাসভূমি গড়তে, সেই বাসভূমি রক্ষা করতে কুশীগঞ্জের প্রবাসী করণিকের যাপন থেকে কোনো মুক্তি নেই তার। আবার অন্যদিকে চন্দননগরে বাবুদের বাগানবাড়িতে অকস্মাৎ নৌকাডুবির সুবাদে সে-জায়গায় এসে পড়া আবিশ্ব পরবাসী নীলকান্তর কোনো যথার্থ আশ্রয় থাকা অসম্ভব। বিত্তবানের প্রবাসী জীবনে নিজের নির্বিকল্প পরবাস নিয়ে এসে পড়তে পারে দুর্ভাগা নীলকান্ত, কিন্তু পুনরায় নিরুদ্দেশে মিশে যাওয়া ছাড়া তার মতো খড়কুটোর কীই বা ভবিতব্য? নীলকান্তকে কেঁদে কেঁদে খোঁজে তার একদিনের পোষ্য কুকুরটা—সে যে ছিল পরবাসীর, নিরাশ্রয়ের আশ্রিত। আর 'আপদ' (ফাল্গুন, ১৩০১)-এ ওই করুণ কান্না শুনতে শুনতে পাঠকের কি মনে পড়ে যায় তিনবছর আগেকার বালিকা রতনকে? যে পোস্টমাস্টারের আপিস- ঘরের চারদিকে অশ্রুজলে ভেসে ভেসে ঘুরছিল, পোস্টমাস্টার বদলি নিয়ে চলে যাওয়ার পরে? রতনেরও তো আশ্রয় জুটেছিল নেহাতই এক পরবাসীর কাছে!

নিরুদ্দেশযাত্রা ছাড়া কীই বা করবার ছিল গ্রামের স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ বৈদ্যনাথের ('স্বর্ণমৃগ', ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯)? বাবুবাড়ির দরিদ্র ভৃত্য রাইচরণের ('খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', অগ্রহায়ণ ১২৯৮) দেশের ঠিকানায় পাঠানো টাকা যখন ফেরত আসে, তেমন কোনো লোকের হদিস মেলে না সেখানে, পাঠকের বড়োজোর ধাক্কা লাগে মনে। অথচ হারিয়ে যাওয়া ছাড়া কীই বা বিকল্প ছিল রাইচরণের? 'চন্ন' ছাড়া আর যে কোনো পরিচয় সে নিজের জন্য বানাতে পারেনি! আজ সেই পরিচয়ের অবশেষটুকুও যখন লোপাট করে দিল তার সাজানো এই প্রত্যাবর্তনের খোকাবাবু, তখন তো সত্যিই আর কোনো জায়গাই এই বিশ্বে পড়ে নেই যে রাইচরণের আশ্রয় মিলবে! পরবাসের এত বিচিত্র অবয়ব দেখতে-দেখতেও কি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন পাঠক, যে, হালদারগোষ্ঠীর বড়োবাবু

বনোয়ারি কোনোদিন একাকার হয়ে যেতে পারে দরিদ্র ভৃত্য রাইচরণের সঙ্গে! কিন্তু হালদারগোষ্ঠীর বড়োবাবুর জীবন যে বনোয়ারির কাছে পরবাসীর জীবন। বনোয়ারির পিতা মনোহর জমিদারি কিংবা সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে বড়ো ছেলে অর্থাৎ বনোয়ারি অপেক্ষা অনেক বেশি আস্থা রাখেন তাঁর অনুচর নীলকণ্ঠের উপরে। তাঁর এই মনোভাবে অন্যায্য কিছু নেই। কারণ বনোয়ারিকে যারা জানে, তারা সকলেই মানে, সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে বনোয়ারি আদৌ উপযুক্ত নয়। না-হলে, জমিদারির কাছারি থেকে নেওয়া ঋণ বছরের পর বছর শুধতে না-পেরে প্রজারা যখন গা-ঢাকা দেয়, ঋণের বোঝা পুরোটাই যখন নীলকণ্ঠ চাপিয়ে দেয় পালাতে না-পারা ভিটেবাড়ির প্রজা মধু কৈবর্তর উপরে, বনোয়ারি তখন কিনা মধু কৈবর্তের পাশে দাঁড়ায়! এতটাই দাঁড়ায় যে নীলকণ্ঠর জেল পর্যন্ত হয়! এমন ছেলেকে সম্পত্তি থেকে তফাতে রাখায় দোষ কোথায়? তবু তো মাসিক দু'শটাকার বৃত্তি পাবে বনোয়ারি আর তা পাবে নীলকণ্ঠরই হাত থেকে! হালদারগোষ্ঠীর সুনাম-সচ্ছলতা- প্রতিপত্তি রক্ষা যাদের কাছে মোক্ষ, তারা মনোহরের এই সিদ্ধান্তে ভুল কিছু দেখে না। আরে বাবা, সম্পত্তি তো ভোগ করার জিনিস, রক্ষা করার বস্তু! বনোয়ারির হাতে পড়লে, সবই তো যাবে কৈবর্তদের লালনপালনে বা উদ্ধারকার্যে।

এমনকী, বনোয়ারির প্রাণের সহধর্মিণী কিরণেরও তাই মত। এই যে শ্বশুরের উইলে সব সম্পত্তি বনোয়ারির অকালমৃত ছোটভাইয়ের নাবালক পুত্র হরিদাসের নামে আছে, হরিদাস সাবালক হওয়ার আগে পর্যন্ত তা থাকবে নীলকণ্ঠের প্রযত্নে, কিরণ এ-ব্যবস্থায় নিশ্চিন্ত। স্বামীর হাতে সম্পত্তি পড়া মানেই তো হালদারদের বিপদ, কৈবর্তদের পোয়াবারো। এমনকী মধু কৈবর্তও বোঝে, গোঁসাইগঞ্জে বা পৃথিবীর কোনো নিরাপদ স্থানে বসবাসের জন্য বড়োবাবুর থেকে জেল ফেরত নীলকণ্ঠ অনেক জরুরি। তবে কী করবে বনোয়ারি? নীলকণ্ঠর হাত থেকে মাসে মাসে দু'শ টাকা নিয়ে বড়োবাবুগিরি বহাল রাখবে? নাকি হালদারদের সব সম্পত্তি প্রতিযোগী বাঁড়ুজ্যেদের হাতে তুলে দেবে কোনো ফিকিরে? পথে বসাবে হরিদাসকে? অথচ, একমাত্র হরিদাসই, সম্পত্তি, গোষ্ঠী বা জমিদারির যুক্তি বাদ দিয়ে জ্যাঠামশায়কে বড়ো ভালোবাসে! হরিদাসের অমোঘ শৈশব এই গোষ্ঠীর আওতায় পড়ে না। কিন্তু শৈশব তো চিরস্থায়ী নয়! তাই বনোয়ারি এই হালদারগোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করে, পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। চাকরি খুঁজতে যাচ্ছে বনোয়ারি, রুজির দুনিয়ায় তার অবস্থান পোস্টমাস্টার বা ঈশান মজুমদারের থেকে খুব আলাদা হবে, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে গোষ্ঠীর মোহ যে একবার ত্যাগ করেছে, তার তো স্বল্পবিত্ত বৈদ্যনাথ, এমনকী দরিদ্র রাইচরণের সঙ্গে একাসনে বসতে কোনো বাধা নেই। কথা তো একটাই—কোনোভাবে যদি মেলে নিজবাসের সন্ধান। কিন্তু পরদেশকে নিজের বলে মেনে নেয় না যারা, যারা নীলকণ্ঠর কিংবা 'রাসমণির ছেলে'র বগলাচরণের মতো কারও সাহচর্যে আশ্রয় বানাতে রাজি নয়, খোঁজা থামালে তো তাদের চলে না। 'হালদারগোষ্ঠী'র পরিণামে এসে পরবাসের নিরুদ্দেশ অনুভব ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সমাজের স্তরে স্তরে বিছিয়ে গেল। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের

ছোটোগল্পের দুনিয়ায় জেগে রইল হার-না-মানার ইঙ্গিত।

গল্পসপ্তক-এর কাহিনিরা কি তবে গল্পকারের কোনো-না-কোনো পূর্বোচ্চারিত বার্তার সমে ফেরা আয়োজন? 'সম্পত্তি-সমর্পণ' থেকে 'ভাইফোঁটা' কিংবা 'পোস্টমাস্টার' থেকে 'হালদারগোষ্ঠী' কি তেমনই কোনো উদ্যোগ? যেখানে সম্পত্তি আর তার মালিকানার ভয়ানক চেহারাকে অথবা বাঙালির পরাধীন পরগাছা জীবনের অসংগতিকে রবীন্দ্রনাথ পোক্ত থেকে আরও পোক্ত বনিয়াদে গাঁথতে চাইছেন? সমাজ-অর্থনীতির দুরূহ সব বাস্তবকে করে তুলতে চাইছেন জটিল থেকে জটিলতর, বিষণ্ণ থেকে আরও বিষাদময়, আর অবশ্যই পাঠকের গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে আরও অনিবার্য? মরণের বিন্যাসে কী কবিতায়, কী নাটকে, কী গল্প- উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ফিরে ফিরেই অমোঘ। তবু 'শেষের রাত্রি', পাণ্ডুলিপিতে যার নাম ছিল 'পাঁচ রাত্রি', মায়া আর নির্মমকে যেন এক নতুন দ্যোতনায় লালন করে। মণির মন পায়নি যতীন তাদের বিবাহিত জীবনে। আজ যখন যতীন মৃত্যুপথযাত্রী, যতীনের মাসি মণিকে কেন্দ্র করে যতীনের কাছে এক মিথ্যে স্তোকের আবরণ রচনা করছেন। আসলে তো মুমূর্ষু স্বামীকে ফেলে মণি তখন চলে গেছে ছোটোবোনের অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। মাসির বানট গল্পে ভুলে যতীন ভাবে, মণি যেন মরণের বেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাতের অন্ধকার ভরে আছে মণির সপ্রেম দৃষ্টিতে। এতদিনে তার ঘোমটা খুলেছে, আবরণ খসেছে। কিন্তু মাসির বানানো মিথ্যের পৃথিবী চিরস্থায়ী হয় না। যতীন জেনে যায় মণির ঘোমটা এখনো সরেনি। সব মিথ্যেকে মিথ্যে বলে জেনে, তবেই যতীন মৃত্যুর সত্যে পৌঁছতে পারে। এ যেন পাঠকেরও সহনশীলতার পরীক্ষা। ইংরেজি অনুবাদে এ-গল্পের নামকরণ হলো 'মাসি'। গল্প- জুড়ে মাসির অশ্রুহীন স্বাভাবিক সংলাপের পরতে পরতে যেন জমে আছে মর্মভেদী হাহাকার। আর নির্মমতর নামকরণ বোধহয় গল্পটির নাট্যরূপে, যেখানে যতীনের মৃত্যু *গৃহপ্রবেশ*-এর ব্যঞ্জনা পায়।

গল্পসপ্তক সংকলনটি ব্যবসায়িক সাফল্যের মুখ দেখেনি। ১৯২২ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ :

> আমার গল্পসপ্তক প্রভৃতি দুই একখানি বই আজ পর্য্যন্ত প্রথম সংস্করণের চৌকাঠ পার হইতে পারে নাই—বিবাহিত বাঙালী পুরুষের ভয়, পাছে এইগুলি পড়িয়া যথাসময়ে স্বামীর লুচিভাজা সম্বন্ধে স্ত্রীর উৎসাহ লেশমাত্র ম্লান হয়। (*রবীন্দ্ররচনাবলী* ষোড়শ খণ্ড *গ্রন্থপরিচয়*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০০১, পৃ. ৯১৯)

'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র' আর 'অপরিচিতা'র মতো কাহিনি কি রবীন্দ্রনাথের এই রসিকতাকে লালন করে?

গল্পসপ্তক-এর শেষ গল্প 'অপরিচিতা' আজ শতাব্দী পার করেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। একুশ শতকের এই দ্বিতীয় দশকেও কি শম্ভুনাথ সেনের মতো পিতা সচরাচর চোখে পড়ে?

কন্যাকে যিনি দায় মনে করেন না? কল্যাণীর তুল্য স্নিগ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু জোরদার ব্যক্তিত্ব কি আজও মিশে যেতে পেরেছে সমাজ-সংসারের অভ্যাসে অথবা নিয়মে? ওই ব্যক্তিত্বের কাছে 'অপরিচিতা'র কথকের ঐকান্তিক সমর্পণ কি আজকের পাঠককেও খুব স্বস্তি দেয়? 'স্ত্রীর পত্র' লিখতে লিখতে প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ :

> গল্প লিখতে বসেছি কিন্তু লেখার এত ব্যাঘাত যে কি লিখেছি ও কি লিখতে হবে সেটা বারবার ভোলবার জো হয়েছে। গল্প এমনতর খাব্‌লা খাব্‌লা করে লিখ্‌লে তার জোড় মেলানো শক্ত হয় এবং তার ফাটল দিয়ে রস বেরিয়ে যায়...আমার এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্ ঢক্ করে খাবার মত হচ্ছে না—এগুলো গল্প না বল্লেই হয়। (প্রশান্তকুমার পাল *রবিজীবনী* সপ্তম খণ্ড আনন্দ ১৪০৪ ব., পৃ. ১৭)।

জোড়ের দাগ এসব গল্পে যে শেষপর্যন্ত পাঠক খুঁজে পাবেন না, সে-কথা গল্পকার খুবই সম্ভব নিজেও জানতেন। তবে ওই ঢক্ ঢক্ করে খাবার পথে কাহিনির চলন-বলন আর অন্তর্নিহিত যুক্তিটাই বাধা হয়ে উঠতে পারে, এমন কোনো সন্দেহ হয়তো তাঁর ছিল। 'স্ত্রীর পত্রে' 'নারীস্বাতন্ত্র্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশ' ঘটেছিল, *নারায়ণ* পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩২১ সংখ্যায় 'মৃণালের কথা' শিরোনামে বিপিনচন্দ্র পাল গল্পটিকে ব্যঙ্গ করেছিলেন, এটি যে চলিত ভাষায় লেখা (সম্ভবত পত্রের আঙ্গিকে লেখা বলেই) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প (ওই), এসব আর আজ কোনো নতুন কথা নয়। স্নেহলতার আত্মহননের ছায়া যে এ-গল্পে পড়েছিল, তা-ও জানা তথ্য।

কিন্তু যাকে গল্পকার বলছেন, 'খাব্‌লা খাব্‌লা করে' লেখা, তার ভিতরে মৃণালের উত্তরণকে উদ্ভাসিত করতে বিপ্রতীপের আয়োজন যে কতখানি পোক্ত, তা কি তেমন ফিরে দেখা হয়? মৃণাল আর সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবে না, কারণ বিন্দুর জীবনমরণের ভিতর দিয়ে সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয় তার হাড়ে হাড়ে বোঝা হয়ে গেছে। যার সূত্রে বিন্দু মাখন বড়ালের গলির সংসারে এসে পড়েছিল, সেই মানুষটি হলেন মৃণালের বড়ো জা। কয়েকটি ঋজু টানে এই চরিত্রটি কীভাবে আঁকা হলো, মৃণালের চিঠি জুড়ে? গল্পের শুরুতেই আছে :

> তোমাদের বড়ো বউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন। বাংলাদেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং ক'নের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না; তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না। ('স্ত্রীর পত্র', *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড*, ওই, পৃ. ৫৬৭)

এই বড়ো বউয়ের বোন বিন্দু বিধবা মায়ের মৃত্যুর পরে খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে যখন সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের সংসারে এসে পড়ল, তখনকার কথা :

> ...দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা....নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন...যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন

এ তাঁর বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন...অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা...সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার কেবল দুঃখ নয়, লজ্জাবোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।...বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া অর বড়ো কিছু ছিল না, রূপও না, টাকাও না...তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন...সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন...বিন্দুকে...আমার ঘরে টেনে নিলুম...দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।"....আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন... বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল...বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক (তিনি) বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। (ওই, পৃ. ৫৬৯-৭০)।

মাথার উপরে খোলা আকাশ আর চোখের সামনে সমুদ্র নিয়ে মৃণাল যখন সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল, যখন মীরাবাঈয়ের প্রসঙ্গ এল তার চিঠিতে, বলল সে '...লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা' (ওই, পৃ. ৫৭৬)। তখনকার মুক্তির যথার্থ অবয়বকে বুঝতে, উপরের সংকীর্ণর চেয়েও সংকীর্ণ, ক্লিন্নর চেয়েও ক্লিন্ন মানবসংসারের চিত্রটা বড্ড জরুরি। অথচ মৃণালের বাঁচার অঙ্গীকার যেন পাঠককে ভুলিয়ে দিতে পারে যে, এত তুচ্ছ কথাও ছিল ওই পত্রে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যে-বিন্দু অনন্তে উপমা পেল, তার জীবনের অনুষঙ্গগুলো বড়ো বেশি মনে ছিল বলেই না মৃণালের সিদ্ধান্ত! একটি চিঠির বয়ানে সমাজ সংসারের কথা-ব্যথা-কুশ্রীতা কী ভয়ানক রকম জ্যান্ত হয়ে উঠতে পারে, তার এক দলিল এই 'খাব্‌লা খাব্‌লা' করে লেখা গল্পটি। অথচ প্রতিটি ব্যর্থতা, প্রতিটি কুশ্রীতা কী নিদারুণ অসহায়, কতখানি করুণ আর কী আশ্চর্য মানবিক। সেই যে বিন্দুর বিয়ে! যার আগে নিজের দিদিকে সে বলেছিল, 'দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।' মৃণাল চিঠিতে লিখেছে,

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।" (ওই, পৃ. ৫৭২)।

উন্মাদ স্বামীর আচরণে ভীত সন্ত্রস্ত বিন্দু যখন পালিয়ে এল শ্বশুরবাড়ি থেকে, বিন্দুর দিদি বললেন, 'ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।' (ওই, পৃ. ৫৭৪)। আর বিন্দুর আত্মহননের পরে? সে বর্ণনাও মর্মান্তিক এই চিঠিতে :

> দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু, সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে। মরেছে বই তো না; বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত। (ওই, পৃ. ৫৭৫)।

অথচ এই সংসারের সঙ্গে লেগে থাকাকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপমায় ভাবাটাই তো দস্তুর। সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে মৃণাল, কিন্তু অসহায় বড়ো জায়ের জন্য তার দুশ্চিন্তা উবে যায় না। স্বামীকে সে লেখে, 'একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি। দোহাই ধর্মের, সে জন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।' (ওই, পৃ. ৫৭২)। আমার তো মনে হয়, নারী স্বাতন্ত্র্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশ 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে যত জায়গায় নিজেকে একেবারে অকৃপণ বিছিয়ে দিয়েছে, উপরের ওই অংশটি তাদের অন্যতম। চেনা গল্পের পাঠ-সম্ভাবনা তো সর্বদা তত চেনা না-ও হতে পারে! 'হৈমন্তী'ও খুব চেনা গল্প। হিমালয়ের কোলে বেড়ে উঠেছে যে মেয়ে, তার কাছে বদ্ধ কলকাতা শহর, সেখানকার আরও বদ্ধ শ্বশুরঘর যে কী ভয়ানক ভার, কতখানি বন্ধন, সেই বোধটুকু কাহিনির ছত্রে ছত্রে মাখানো। ১৯১৪-র ১০ মে রবীন্দ্রনাথের রামগড় যাত্রা শুরু। ক-বছর আগে সেখানে কেনা 'স্নো-ভিউ গার্ডেনস্' বাড়িটির নাম বদলে রাখলেন 'হৈমন্তী'। রবীন্দ্রনাথের জীবনীতে আছে, 'হৈমন্তী' 'নামটিকে তিনি স্মরণীয় করে রাখলেন এখানে বসেই লেখা "হৈমন্তী" গল্পে...গল্পটিতে হিমালয়ের ঋজু মহিমার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এটি নিশ্চয়ই রামগড় যাওয়ার পরে লেখা' (প্রশান্তকুমার পাল *রবিজীবনী* সপ্তমখণ্ড, ওই পৃ. ১৩)।

হিমালয়ের বিপুল ব্যাপ্তির সঙ্গে নৈকট্য নিশ্চয় বাড়িয়েছিল 'হৈমন্তী' কাহিনির সৌষ্ঠব। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। বাবা-মেয়ের শেষ কথোপকথনে পাঠক দেখলেন, হাসি কেমন করে কান্নার চেয়েও দুর্বহ হতে পারে। এ-গল্প যে অনেকদিন আগে লেখা 'দেনাপাওনা'র (১২৯৮?) করুণাকে অনায়াসে পেরিয়ে যায়, তার অন্যতম কারণ ওই হাসির মধ্যেই নিহিত। 'হৈমন্তী'তে বিষাদকে ধারণ করে আছে তির্যক বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা। হৈমন্তীর মৃত্যুর খবর পাঠককে দিতে তার স্বামী, অর্থাৎ কাহিনির কথক বলছেন :

> যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিত না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। ...যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম...সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে

> যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন...আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত। ('হৈমন্তী', *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড*, ওই পৃ. ৫৫৬)।

কিন্তু মা পুনরায় পাত্রীর সন্ধান করছেন, মায়ের সুপুত্র অপু এমন কথা কী করে বলে যে সম্ভাব্য ওই দ্বিতীয় বিয়েতে সে কিছুতেই মত দেবে না? এই হলো, চলনের ঋজুতাকে এতটুকু ব্যাঘাত না করে বিদ্রূপের ভিতরে ভিতরে সংসারের স্বরূপটাকে চেনানোর বয়ান। এ কাহিনি লিখবার অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে মাধুরীলতার ক্ষয়রোগের সূচনা। সৃজনে এবং জীবনে কত ভাবেই না মৃত্যুকে বহন করেছেন এই স্রষ্টা! বেলার রোগশয্যায় উপস্থিত থেকেছেন দীর্ঘসময়, কিন্তু জীবনের এবং সৃজনের কর্মময়তায় কোনো ছেদ পড়েনি। 'হৈমন্তী'র পর 'বোষ্টমী', 'বোষ্টমী'র পর 'স্ত্রীর পত্র', তারপর একের পর এক 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি', 'অপরিচিতা', তো সেই বিপুল কর্মের নামমাত্র অংশ। সন্তানশোক শিয়রে নিয়ে যিনি বলতে পারেন 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়', তাঁর পারার ব্যাপ্তি তো পর্বতদুহিতা হৈমন্তীর অবসানে অথবা সুবোধের শূন্য হাতে মায়ের কাছে প্রত্যাবর্তনে কিংবা প্রেমিক যতীনের সত্যি- মিথ্যের বোঝাপড়ায় অনেকখানি অধরা থেকে যাবেই!

আর, সাধারণ পাঠক ধন্দে পড়বেন, ওই যে আনন্দী বোষ্টমী সত্যসন্ধানের ভিতরে ভিতরে শিশু সন্তানের মৃত্যুস্মৃতি, ফেলে আসা সংসার আর স্বামীর স্মৃতি লালন করতে করতে বলে, 'পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়' ('বোষ্টমী', *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড*, ওই, পৃ. ৫৬৬), তার গল্প কি সত্যিই গল্প, নাকি কবিতা, নাকি অন্য কিছু? এই বোষ্টমীর বাস্তবভিত্তি যে সর্বক্ষেপি নামেক এক বৈষ্ণবী, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ জানতেন, এ তথ্য নতুন নয়। *সবুজপত্র*-র আষাঢ় ১৩২১ সংখ্যায় এ-গল্প প্রকাশিত হওয়ার আগেই প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন :

> সাহিত্যের এলাকায় আমার কাজের দিন ফুরিয়ে গেছে—সত্য মিথ্যা বিস্তর কথা জমিয়ে তুলেছি—সেগুলো এখন কালের ছাঁকুনির ভিতর দিয়ে ছাঁকা হতে থাক, আর নতুন জঞ্জাল বাড়াতে ইচ্ছা হয় না—এখন নিজের জীবনটাকে কি করে সম্পূর্ণ সত্য করতে পারব এই বেদনায় আমাকে দিনরাত্রি জাগিয়ে রেখেছে। (প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী* সপ্তম খণ্ড, ওই, পৃ. ১৬-১৭)।

রামগড় থেকে লেখা এই পত্রাংশ উদ্ধৃত করে জীবনীকার বলেন, ' "বোষ্টমী" গল্পের লেখক ও আনন্দী উভয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই কথাগুলিই এমনভাবে গল্পরূপ লাভ করেছে যে, মনে হয়, গল্পটি সমকালেই রামগড়ে লেখা।' (ওই, পৃ. ১৭)।

রামগড় অথবা বোলপুর কিংবা আর কোথাও—যেখানেই হোক 'বোষ্টমী'র রচনাস্থল,

সমগ্র *গল্পগুচ্ছে*-র সব মহিমা মনে রেখেও এ কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথেরও বিরলতম সৃজনের একটি বলা যায়। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে প্রথম প্রকাশিত 'উদ্ধার' গল্পটির স্মৃতি কি গল্পকারের মনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল ১৩২১-এ 'বোষ্টমী' লিখবার সময়ে? সত্যের মোকাবিলায়, দৈনন্দিন আর চিরকালীনের ভাঙাগড়ায় আরও বড়ো ঝুঁকি নিতে হবে আরও প্রশান্ত চলনে? এমনই কি কোনো ভাবনা ছিল রবীন্দ্রনাথের? আনন্দীর সন্তানশোকে উপশমের কাজ করত আনন্দীর স্বামীর গুরুঠাকুরের শাস্ত্রব্যাখ্যা। গুরুঠাকুরের সেবায় তার শূন্য জীবনে অর্থ ফিরে আসতে লাগল। গল্পের লেখককে আনন্দী বলে, 'সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল।' (ওই, পৃ. ৫৬৪)। এক ফাল্গুনের সকালে ঘাটের পাশে সদ্যস্নাতা আনন্দীকে দেখে গুরুঠাকুর তার নাম ধরে ডাকলেন, তার মুখের 'পরে চোখ রেখে বললেন, 'তোমার দেহখানি সুন্দর।' 'বোষ্টমী' গল্পে আছে:

> ডালে ডালে রজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝাপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুমকিগুলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল...আমার সে পৃথিবী আর নাই...সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে। (ওই, পৃ. ৫৬৫)

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই আনন্দী তার সাদা মনের স্বামীকে জানিয়ে দিল, সে আর সংসার করবে না। গুরুঠাকুর তাকে সংসার ছাড়তে বলেছেন। স্বামী চাইলেন, দুজনে গুরুঠাকুরের কাছে গিয়ে বুঝে নিতে, কোথায় কী ঘটল যে এমন আদেশ! আনন্দী স্বামীকে জানাল, গুরুঠাকুরের সঙ্গে এ-জীবনে তার আর দেখা হবে না। আনন্দীর স্বামী আর কোনো কথা বলেননি, গুরুর বিচারে এই স্বামীটির বোধবুদ্ধি নাকি স্ত্রী-র থেকে কমই ছিল; এমনই ছিল তাঁর স্বভাব যে, মাথার উপর অন্তত একটি মানুষকে না-বসিয়ে তিনি শান্তিতে জীবনধারণ করতে পারতেন না, কিন্তু সেদিনের আনন্দী, যে আজ বোষ্টমী পরিচয়ে নিজের জীবনকাহিনি বলতে বসেছে, সে জানে, চিরকালই সে তার স্বামীর চেয়ে বলত বেশি আর স্বামী তার চেয়ে বুঝতেন বেশি। সংসার জীবনের সেই সর্বশেষ ভোরেও, গুরুঠাকুরের সঙ্গে আনন্দীর আর দেখা হবে না শুনে 'তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না....জানি, আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।' (ওই, পৃ. ৫৬৬)।

অনুক্তের পর্দায় যে কত অর্থবহ স্বর যোজনা করা যায়, 'বোষ্টমী' তার এক আশ্চর্য নিদর্শন। আর এক চিল্‌তে বেশি বললেও যেন গল্পের সত্য ব্যাহত হতো, অসম্মানিত

হতো আনন্দীর সত্য সন্ধান। অথচ ফিরে ফিরে পড়লে মনে হবে, এ-বিন্যাস যেন কোনো সত্যির মার থেকেই পাঠককে রেহাই দিচ্ছে না। কেবলমাত্র গরম লুচিতে স্বতঃসিদ্ধ অধিকার হারানোর পুরুষালি আশঙ্কা নয়, আরও অনেক অনিশ্চিতিই তবে বিছিয়ে দিতে পারত *গল্পসপ্তক*। বিচিত্র সব বিষয়ে তার সতর্কীকরণ, অথচ ভাবখানা যেন নিটোল গল্প বলা ছাড়া আর কোনো দায়দায়িত্বই তার নেই। সেই অছিলায় সম্পত্তি থেকে যথার্থ সম্পদের দিশায়, পরবাস থেকে নিজবাসের দিশায়, অসংগত যৌথতা অথবা বন্ধন থেকে মুক্তির দিশায় তার দিকচিহ্নগুলি চেনা যায়। যেন বোঝা যায়, ওই দিশাটুকু, এমনকী তার ইঙ্গিতটুকুই মূলকথা। অর্জনের বেশি-কম, জয়-পরাজয়ের উভটান কখনও সত্যসন্ধানের ভিত বানাতে পারে না। হয়তো গোটা *গল্পগুচ্ছে*রই একটা আদল ধরা ছিল *গল্পসপ্তক*-এ। একুশ শতকে আজ প্রেম-অপ্রেম, লোভ-চাহিদা, পাওয়া না-পাওয়া সবই অনেক জটিল। রবীন্দ্রনাথ কি শতাব্দীর ওপারে দাঁড়িয়ে সেই জটিলতরকে অনেকখানি দেখতে পেয়েছিলেন?